একক ৩৬ ❐ বাংলা ছন্দোবন্ধ

গঠন

৩৬.১ উদ্দেশ্য

৩৬.২ প্রস্তাবনা

৩৬.৩ মূলপাঠ-১ ঃ পয়ার

৩৬.৪ সারাংশ-১

৩৬.৫ অনুশীলনী-১

৩৬.৬ মূলপাঠ-২ ঃ অমিত্রাক্ষর

৩৬.৭ সারাংশ-২

৩৬.৮ অনুশীলনী-২

৩৬.৯ মূলপাঠ-৩ ঃ চতুর্দশপদী

৩৬.১০ সারাংশ-৩

৩৬.১১ অনুশীলনী-৩

৩৬.১২ সামগ্রিক অনুশীলনী

৩৬.১৩ গ্রন্থপঞ্জি

৩৬.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি মনোযোগের সঙ্গে পড়ার পর—

- এমন একটি কৌশল আয়ত্ত হওয়া সম্ভব, যার সাহায্যে বুঝে নিতে পারবেন—একটি কবিতায় ছত্রের পর ছত্র ধরে ছন্দ আর অর্থ পাশাপাশি কীভাবে চলতে থাকে, চলতে চলতে এরা কে কোথায় সীমানা খুঁজে পায় আর থামে, এবং এই চলা আর থাা থেকে ছন্দ-অর্থের কী সম্পর্ক তৈরি হয়।
- ছত্রের পর ছত্র সাজাতে গিয়ে ছন্দ আর অর্থের সম্পর্ককে কবি কোন শাসনে বাঁধলেন, তা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়বে।
- ছত্রের বিন্যাসে আর ছন্দ-অর্থকে পাশাপাশি চালানোতে কবির দক্ষতা কতখানি, তার পরিমাপ করতে পারবেন।
- প্রথার একঘেয়ে শাসন থেকে কবিরা ক্রমশ বাংলা কবিতার ছন্দকে কীভাবে মুক্ত করে আনলেন, তা আন্দাজ করতে পারবেন।

৩৬.২ প্রস্তাবনা

ছত্রনির্মাণ ছত্রবিন্যাস মিলের ব্যবহার আর ছত্রের পর ছত্র ধরে চলতে-থাকা ছন্দ-অর্থের সম্পর্ক—এসব নিয়ে ছন্দের দিক থেকে কবিতার শরীর গঠনের প্রক্রিয়া প্রায় নির্দিষ্ট বাঁধা ছিল বহুকাল। প্রথার শাসনকে অমান্য করার মতো জোরা বাঙালি কবির ছিলই না। ছন্দের এই বাইরের বন্ধন কী ধরনের ছিল, তা থেকে বাংলা কবিতার মুক্তির পথ কীভাবে তৈরি হল, সেইসঙ্গো বিরক্তিকর একঘেয়েমি কাটিয়ে কবিতার শরীর গঠনে ক্রমশ বৈচিত্র্য কীভাবে এল—তার খানিকটা আভাস এই এককের পাঠে তুলে ধরা হল।

ছন্দরীতির আলোচনা থেকে আপনারা জানলেন, দলের (বা অক্ষরের) সঠিক উচ্চারণ (টেনে-টেনে বা কেটে-কেটে) থেকে বেরিয়ে আসে দলের সঠিক মাত্রা, পর্বের মধ্যে সেই মাত্রার বিন্যাস থেকেই ক্রমশ ধরা পড়ে পর্বের পঙ্‌ক্তির (বা চরণের) স্তবকের, অবশেষে একটি গোটা কবিতার ছন্দ-স্বভাব—ছন্দের ভেতরকার পরিচয়। এবারে এগিয়ে চলুন ছন্দের বাইরের একটা পরিচয়ের দিকে, ছান্দসিকেরা যাকে বলেন **ছন্দোবন্ধ**। ছন্দরীতি হল ছন্দের প্রকৃতি, আর 'ছন্দোবন্ধ' ছন্দের আকৃতি। ছন্দরীতি নির্ভর করে দলের মাত্রা আর মাত্রাবিন্যাসের ওপর, **'ছন্দোবন্ধ'** নির্ভর করে পর্বের মাপ আর পর্ববিন্যাসের ওপর। কোন্ দল কত মাত্রা ধরে উচ্চারণ করব—এর ওপর নির্ভর করে ছন্দরীতি। মাত্রাবিন্যাসের পর যতি কোথায় পড়বে, অর্থাৎ পর্বের মাপ কত মাত্রার হবে, পর্বের পর পর্ব সাজিয়ে কীভাবে পঙ্‌ক্তি বা চরণ তৈরি করব—এর ওপর নির্ভর করে 'ছন্দোবন্ধ'

নীচের দৃষ্টান্ত-দুটি দেখুন—

```
     ২ ১ ১      ২ ১ ১  | ২ ১ ১ ২    ||
১.  তাল্‌গাছে   তাল্‌গাছে | পল্লবচয়্   ||  = ৮ + ৬
     ২  ২       ২ ১ ১  | ২ ১ ১ ২    ||
    চন্‌চল্     হিল্লোলে | কল্লোলময়্  ||  = ৮ + ৬

     ১ ১   ১ ১   ১ ১   ১ ১ | ১ ১ ১    ১ ১ ১   ||
২.  পুণ্‌ণে  পাপে  দুক্‌খে  সুখে | পতনে    উত্‌থানে ||  = ৮ + ৬
     ১ ২   ১ ১ ১   ২  | ১ ২   ১ ১ ১   ||
    মানুষ  হইতে   দাও | তোমার্ সন্‌তানে ||  = ৮ + ৬
```

প্রথম দৃষ্টান্তে প্রতিটি রুদ্ধদলের উচ্চারণ ২-মাত্রায়—অতএব, রীতি কলাবৃত্ত (বা ধ্বনিপ্রধান)। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে রুদ্ধদল শব্দের প্রথমে ১-মাত্রার (পুণ্ দুক্ উত্ সন্), শব্দের শেষে ২-মাত্রার (নুষ্ মার্)—অতএব, রীতি মিশ্রবৃত্ত (বা তানপ্রধান)। ২টি দৃষ্টান্তে পৃথক্ ছন্দরীতি। এবারে যতিচিহ্ন, পর্বের মাপ আর পর্ববিন্যাসের দিকে তাকান।

২টি দৃষ্টান্তেই—

(১) অর্ধযতি (বা পর্বযতি) পড়েছে ৮-মাত্রার পর।

(২) পূর্ণবতি (পঙ্‌ক্তিযতি) পড়েছে ৮ + ৬ বা ১৪-মাত্রার পর

(৩) পূর্ণযতি (পঙ্‌ক্তিযতি) ৮-মাত্রার, দ্বিতীয় পর্ব বা পদ ৬-মাত্রার।

(৪) প্রতি চরণে (বা পঙ্‌ক্তিতে) ৮ + ৬ মাত্রার পর্ববিন্যাস (বা পদবিন্যাস)।

২টি দৃষ্টান্তের এই মিল আসলে চরণ বা পঙ্‌ক্তি-গঠনের মিল। এ মিল বাইরের, এ পরিচয় বাইরের। এরই নাম 'ছন্দোবন্ধ'। ভেতরকার পরিচয়ে ভিন্ন হলেও বাইরের পরিচয়ে স্তবক-দুটি এক। ছন্দরীতি পৃথক্ হলেও এদের 'ছন্দোবন্ধ' এক।

এই এককে বাংলা কবিতার তিনরকম ছন্দোবন্ধ নিয়ে তিনটি ভাগে আলোচনা হবে—পয়ার, অমিত্রাক্ষর আর চতুর্দশপদী।

৩৬.৩ মূলপাঠ-১ ঃ পয়ার

পয়ার একটি 'ছন্দোবন্ধে'র নাম। ৮ + ৬ মাত্রার পর্ববিন্যাসে চরণ (বা ৮ + ৬ মাত্রার পদবিন্যাসে পঙ্‌ক্তি) তৈরি হলে তার ছন্দোবন্ধের নাম 'পয়ার'। হয়তো 'পদাকার' (পদ + আকার) কথাটি থেকে 'পয়ারে এসেছে। প্রাচীন বাংলা কাব্যের ৮ + ৮ মাত্রার চরণ ক্রমশ ৮ + ৭ এবং তা থেকে ৮ + ৬-এ নেমে এসে 'পয়ারে'-র বাঁধা নিয়মে স্থির হয়ে রইল আধুনিক বাংলা কাব্য পর্যন্ত। একটু আগে যে-দুটি দৃষ্টান্ত থেকে 'ছন্দোবন্ধে'র পরিচয় পেলেন, সেই দৃষ্টান্ত-দুটি 'পয়ার' ছন্দোবন্ধের। 'পয়ার' নিঃসন্দেহে একটি প্রাচীন ছন্দোবন্ধ। একাবলি ত্রিপদী চৌপদী—এইসব প্রাচীন ছন্দোবন্ধ বাংলা কবিতা থেকে ক্রমশ সরে গেছে অথবা সরে যাবার পথে। কিন্তু, 'পয়ার' এখনো টিকে আছে। অবশ্য তার রূপে বৈচিত্র্য এসেছে। সে বৈচিত্র্যের পরিচয় ক্রমশ পাবেন, দেখবেন—'পয়ার' কীভাবে একটি আধুনিক ছন্দোবন্ধ হয়ে উঠেছে, সেইসঙ্গে তার নামেরও বদল ঘটেছে।

প্রাচীন ছন্দোবন্ধ হিসেবে পয়ারের মূল শর্ত ৪টি—

১. প্রতি স্তবকে ২টি চরণ (বা পঙ্‌ক্তি) থাকবে।

২. চরণ-দটির অন্ত্যমিল থাকবে (মিত্রাক্ষর)।

৩. প্রতি চরণে (বা পঙ্‌ক্তিতে) ২টি করে পর্ব (বা পদ) থাকবে।

৪. প্রথম পর্ব (বা পদ) ৮-মাত্রার, দ্বিতীয় পর্ব বা পদ ৬-মাত্রার হবে।

নীচের দৃষ্টান্তটি লক্ষ করুন—

১ ১ ১ ১ ২		১ ১	১ ১ ১	১ ২	
মহাভারতের্		কথা	অমৃত	সমান্	= ৮ + ৬
১ ১ ২	২	১ ১	১ ১	১ ১ ২	
কাশীরাম্	দাস্	কহে	শুনে	পুণ্‌বান্	= ৮ + ৬

স্তবকটিতে পয়ারের ৪টি শর্তেরই পূরণ হয়েছে। এটাও জেনে রাখা ভালো—পয়ার ছন্দোবন্ধে লেখো সব পুরোনো কবিতারই ছন্দ-রীতি ছিল মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান। আসলে ছন্দ-রীতির এসব আধুনিক নাম চালু হবার আগে পর্যন্ত অমূল্যধন তো তানপ্রধান রীতির পরিচয় দিতেন পয়ারজাতীয় ছন্দ হিসেবেই।

ক্রমশ বৈচিত্র্য এল আধুনিক কবিতার পয়ারের রূপে। প্রবোধচন্দ্র তিনি দিক থেকে এ বৈচিত্র্য তুলে ধরলেন—আয়তনের দিক থেকে, ছন্দ-রীতির দিক থেকে, গতিভঙ্গির দিক থেকে। দৃষ্টান্তের সাহায্য নিয়ে পর পর পয়ারের বৈচিত্র্য লক্ষ করুন—

১. আয়তনের দিক থেকে পয়ারের ২টি রূপ ঃ পয়ারের যে ৪টি মূল শর্তের কথা আগে জেনেছে, তার চতুর্থ শর্তে ছিল পয়ারের একটিমাত্র আয়তন বা দৈর্ঘ্যের উল্লেখ। পয়ারের আয়তন ছিল নির্দিষ্ট—৮ + ৬ মাত্রা। প্রথম পর্বের (বা পদের) ৮-মাত্রা ঠিক রেখে দ্বিতীয় পর্বের (বা পদের) দৈর্ঘ্য কোনো কোনো পয়ারে বাড়ানো হল—৬-মাত্রার বদলে ১০-মাত্রা। এর নাম হল বড়ো পয়ার বা মহাপয়ার। অতএব, ৮ + ৬ মাত্রার পয়ার যেমনটি ছিল, তেমনই রইল, এর সঙ্গে যুক্ত হল ৮ + ১০ মাত্রার 'মহাপয়ার'। ৮ + ৬ মাত্রার 'ছোটো পয়ারে'র দৃষ্টান্ত ('মহাভারতের কথা....') একটু আগে দেখলেন। এবারে দেখুন ৮ + ১০ মাত্রার 'মহাপয়ারে'র দৃষ্টান্ত—

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ | ১ ২ ১ ২ ১ ১ ২ ||
একথা জানিতে তুমি | ভারত্-ঈশ্শর্ শা-জাহান্ || = ৮ + ১০

১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ | ১ ২ ১ ২ ১ ১ ২ ||
কালস্রোতে ভেসে যায় | জীবন্ - যৌবন্ ধনমান্ || = ৮ + ১০

২. ছন্দ-রীতির দিক থেকে পয়ারের ৩টি রূপ ঃ পয়ার-বন্ধে লেখা পুরেনো সব কবিতারই একমাত্র ছন্দরীতি মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান, এ কথা একটু আগে জেনেছেন। কিন্তু, পয়ার-বন্ধে বাঁধা একটি আধুনিক কবিতার ছন্দরীতি **দলবৃত্ত (শ্বাসাঘাতপ্রধান)** হতে পারে, **কলাবৃত্ত (ধ্বনিপ্রধান)** হতে পারে, **মিশ্রবৃত্তও (তানপ্রধান)** হতে পারে। দৃষ্টান্ত দেখুন—দলবৃত্ত পয়ার।

১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ ||
আজ্ বিকালে | কোকিল্ ডাকে || শুনে মনে লাগে = ৮ + ৬

১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ || ১ ১ ১ ১ | ১ ১
বাংলাদেশে | ছিলাম্ যেন || তিন শো বছর | আগে = ৮ + ৬

(প্রবোধচন্দ্রের পদ-বিভাগ)

কলাবৃত্তের পয়ার ঃ

২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ | ২ ১ ১ ২ ||
নিম্নে যমুনা বহে | স্বচ্ছ শীতল্ || = ৮ + ৬

২ ১ ১ ২ ২ | ২ ১ ১ ২ ||
ঊর্ধ্বে পাষাণ্-তট্ | শ্যাম্ শিলাতল্ || = ৮ + ৬

মিশ্রবৃত্ত পয়ার ঃ

১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ ২ ||
দুয়ারে প্রস্তুত্ গাড়ি | বেলা দ্বিপ্রহর || = ৮ + ৬

১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ ২ ||
শরতের্ রৌদ্র ক্রমে | হতেছে প্রখর্ || = ৮ + ৬

লক্ষ করছেন, ৩-রকম ছন্দরীতির ৩টি দৃষ্টান্তই পয়ারের প্রতিটি শর্ত (৮ + ৬ মাত্রার অন্ত্যমিল-থাকা ২টি চরণ বা পঙ্‌ক্তি) মেনে চলেছে। কেবল ভেঙে দিয়েছে মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান রীতির একঘেয়ে প্রথার দেয়ালটি।

৩. গতিভঙ্গির দিক থেকে পয়ারের ৩টি রূপ ঃ

পয়ার-বন্ধের চতুর্থ শর্তকে (৮ + ৬ মাত্রার চরণ) খানিকটা শিথিল করে ৮ + ১০ মাত্রার 'মহাপয়ার' তৈরি হল কীভাবে, তা লক্ষ করেছেন। এবার প্রথম শর্তের ওপর আঘাত। পয়ার-বন্ধের প্রথম শর্ত—২টি চরণ (বা পঙ্‌ক্তি) নিয়ে স্তবক তৈরি হবে। এই শর্তটির অর্থ ১টি চরণে না হলে ২টি চরণের মধ্যে একটি বক্তব্যকে সম্পূর্ণ করতে কবি বাধ্য থাকবেন। অর্থাৎ, একটি বক্তব্যের মাপ ২-চরণের বেশি নয়। অন্য ৩টি শর্তের সঙ্গে পয়ারের এই শাসনও বাংলা কবিতার কবিরা মেনে চললেন উনিশ শতক পর্যন্ত। এর পর থেকে কোনো কোনো পয়ার সব শর্ত মেনে তৈরি হল, কোনো কোনো পয়ার প্রথম শর্ত পুরোপুরি মানল না। এমনি করে গড়ে উঠল পয়ারের ৩টি রূপ—অপ্রবহমান, **প্রবহমান** আর **মুক্তক**।

পুরোনো সব শর্ত মেনে ২-চরণের সীমানায় বক্তব্যকে ধরে রেখে যেসব পয়ার লেখা হল সেখানে নির্দিষ্ট সীমানা পেরিয়ে ঐ বক্তব্য বা ভাব পরের চরণগুলিতে প্রবাহিত হবার সুযোগ পেল না। এ-ধরনের পয়ারকে বলা হল **অপ্রবহমান পয়ার**। এ পর্যন্ত পয়ারের যে-কটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, তার সবই অপ্রবহমান পয়ার-এর।

যে-পয়ারে চরণের মাপ ৮ + ৬ বা ৮ + ১০ মাত্রায় স্থির রেখে, চরণের অন্ত্যমিল রেখে বা না-রেখে কোনো বক্তব্য বা ভাব ২-চরণের সীমানা পেরিয়ে পরের চরণগুলিতে প্রবাহিত হতে পারে, ২-চরণের সীমানার মধ্যেও অবাধে চলতে পারে, তার নাম হল **প্রবহমান পয়ার**। নীচের দৃষ্টান্তটিতে ভাবের এই প্রবাহ লক্ষ করুন—

১ ১ ২ ১ ১ ২ | ১ ১ ১ ১ ১ ১ ||
কবিবর্, কবে কোন্ | বিস্মৃত বরষে || = ৮ + ৬

২ ১ ১ ১ ১ ২ | ১ ২ ১ ১ ১ ||
কোন্ পুণ্‌ণ আষাঢ়ের | প্রথম্ দিবসে || = ৮ + ৬

লিখেছিলে মেঘ্‌দূত। .....।

ব্যাকরণের নিয়মে একটি বক্তব্যকে পুরোপুরি ধরে রাখার জন্য চাই কমপক্ষে একটি বাক্য। অথচ, ওপরের ২টি চরণ মিলেও পূর্ণ বাক্য তৈরি হল না। 'কোন্' শব্দটিতে একটা প্রশ্নের সংকেত আছে, কিন্তু কী নিয়ে এ-প্রশ্ন তার উল্লেখ চরণ-দুটিতে নেই। তার পরে ভাব অসম্পূর্ণই থাকল। মেঘদূত-লেখার উল্লেখ পাবার সঙ্গে সঙ্গে বাক্য পূর্ণ হল, বক্তব্যও পুরোপুরি ধরা পড়ল। ভাব ততক্ষণে ২-চরণের সীমানা পেরিয়ে প্রবাহিত হল তৃতীয় চরণের দিকে। অতএব, স্তবকটি হয়ে উঠল প্রবহমান পয়ারের দৃষ্টান্ত। দেখাই যাচ্ছে, দৃষ্টান্তটি ৮ ঃ ৬ মাত্রার—ছোটো পয়ারের। আর একটি দৃষ্টান্ত দেখুন ৮ + ১০ মাত্রার প্রবহমান মহাপয়ারের—

১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ | ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ||
সংসারে সবাই যাবে | সারাক্ষণ্ শত কর্মে রত || = ৮ + ১০

২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ২ ১ ১ ২ ১ ১ ||
তুই শুধু ছিন্নবাধা | পলাতক্ বালকের্ মতো || = ৮ + ১০

১ ১ ২ ১ ২ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ||
মদ্ধ্যান্নে মাঠের মাঝে | একাকী বিষণ্ণ তরুচ্ছায়ে || = ৮ + ১০

১১১১১১১১ || ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ||
দুরবনগধবহ || মন্দগতি ক্লান্ত তপ্ত বায়ে || = ৮ + ১০

১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১
সারাদিন বাজাইলি বাঁশি।.....

একটি বক্তব্য বা ভাব পরপর ৪টি চরণের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে হতে অবশেষে পঞ্চম চরণের মাঝামাঝি গিয়ে থামল।

এতক্ষণ ধরে আপনারা লক্ষ করেছেন—'অপ্রবহমান পয়ার' পয়ারের সব শর্ত মেনে চলে, 'প্রবহমান পয়ার' কেবল ২-চরণের সীমানায় ভাবকে ধরে রাখার শাসনটুকু মানে না, আর সব শর্ত মেনে নিতে বাধা নেই। তবে, পয়ারের এই ২টি রূপেই প্রতিটি চরণের মাপ নির্দিষ্ট— ৮+৬ মাত্রা বা ৮ + ১০ মাত্রা। ক্রমশ পদ্যের স্তবক-রচনায় কবিরা চরণের এই নির্দিষ্ট আয়তন অস্বীকার করতে চাইলেন। ভাবকে ২-চরণের সীমানার বাঁধন থেকে ছাড়িয়ে আনা ত হল-ই, সেইসঙ্গে চরণের মাপও নানারকম হতে লাগল, কখনো কখনো একটি চরণকে ছোটো-বড়ো নানা ছত্রে সাজিয়ে স্তব তৈরি করা হল। প্রতি চরণে ২টি পর্ব রাখার শর্তও ভেঙে গেল, ১টি পর্বেই তৈরি হল চরণ। তবে স্তবকটি যে মূলত পয়ারের, এটা বোঝা যাবে সবচেয়ে বড়ো চরণটির মাপ দেখে (৮ + ৬ বা ৮ + ১০)। কোনো-না-কোনো চরণের এই মাপ থাকবেই। অন্য সব চরণের মাপ এর সমান হতে পারে, এর চেয়ে ছোটোও হতে পারে (৬, ৮ বা ১০-মাত্রা—যা পয়ারের ১টি পর্ব বা পদের মাপ)। এ-ধরনের পয়ারের নাম হল **মুক্তক পয়ার**। একটি দৃষ্টান্ত দেখুন—

১ ২ ১ ২ ||
তোমার্ চিকন্ || = ০ + ৬

১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ||
চিকুরের্ ছায়াখানি | বিশ্‌শ হতে যদি মিলাইত || = ৮ + ১০

১ ১
তবে

২ ২ ১ ১ |
এক্‌দিন্ কবে |

১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ||
চন্‌চল্ পবনে লীলায়িত || = ০ + ৬

১ ২ ১ ২ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ ২ ||
মর্‌মর্ মুখর্ ছায়া | মাধবী-বনের্ || = ৮ + ৬

১ ১ ১ ১ ২
হত স্বপনের্ = ০ + ৬

সতর্কতার সঙ্গে ছত্রের পর ছত্র উচ্চারণ করে চলুন। অর্ধযতি (।) আর পূর্ণযতির (॥) চিহ্ন দিয়ে যে জায়গাগুলিকে চিহ্নিত করা হল, তা নিজের ছন্দোবোধের সাহায্যে মিলিয়ে নিন। এবারে লক্ষ করুন ঃ

(১) স্তবকটিতে ছত্র ৭টি, কিন্তু চরণ ৫টি। এর মধ্যে দ্বিতীয় আর তৃতীয় চরণ মহাপয়ারের (৮+১০ মাত্রা), চতুর্থ চরণ সাধারণ পয়ারের (৮+৬ মাত্রা)। অর্থাৎ পয়ারের নির্দিষ্ট মাপ এই চরণগুলিতে মানা হয়েছে।

(২) প্রথম আর শেষ চরণ ৬-মাত্রার। ছোটো পয়ারের (৮+৬) দ্বিতীয় পর্বের (বা পদের) ৬-মাত্রা দিয়েই এক-একটি চরণ তৈরি হয়েছে, ২টি পর্ব (বা পদের) নির্দিষ্ট বরাদ্দ এখানে মানা হয়নি।
এ-দুটি চরণ উচ্চারণ করতে গেলেই প্রথম পর্বটির অভাব কানে লাগে। O-মাত্রা সেই অভাবের চিহ্ন।

(৩) একটি বক্তব্যই প্রথম চরণ থেকে প্রবাহিত হতে হতে পঞ্চম চরণে এসে সম্পূর্ণ হয়েছে। ২-চরণের সীমানার বাঁধ ভেঙে গেল এখানেও।

(৪) তৃতীয় ছত্রের যতি নেই, চতুর্থ ছত্রের শেষে অর্ধযতি (।) পূর্ণযতি (॥) পড়েছে পঞ্চম চরণের শেষে। এর অর্থ, ৮ + ১০ মাত্রার তৃতীয় চরণটিকে ২-মাত্রা, ৬-মাত্রা, আর ১০-মাত্রার, ৩-টি পৃথক্ মাপের ছত্রে ভেঙে সাজানো হয়েছে।

(৫) চরণ-শেষের মিল এ-স্তবকে অনেকটাই রাখা হয়েছে। তবে কবির চোখে যে ছত্রশেষের দিকে, তা বোঝা যায় তৃতীয়-চতুর্থ ছত্রের মিলের দিকে তাকালেই (তবে-কবে), চরণ যেখানে ৩টি ছত্রে ভাগ হয়ে গেছে।

পয়ারের প্রতিটি শর্তই স্তবকটিতে শিথিল। তবু এটি যে পয়ারেরই স্তবক, তার কারণ, এর প্রতিটি চরণই হয় পয়ারের চরণ (৮+৬ বা ৮+১০) না হয় পয়ারের পর্ব (বা পদ) দিয়ে তৈরি (৬-মাত্রার) ?

আমরা দেখলাম, 'পয়ার' নামের একটি প্রাচীন ছন্দোবন্ধ ৮+৬ মাত্রার মাপের ২টি মিত্রাক্ষর (অন্ত্যমিল-থাকা) চরণের শরীর নিয়ে মধ্যযুগের রামায়ণ-মহাভারত-মঙ্গলকাব্যের দীর্ঘ পথ ধরে ক্রমশ পৌঁছল বাংলা কাব্য-কবিতার আধুনিক ঠিকানায়। পৌঁছল বটে, কিন্তু ততদিনে পুরনো শর্তের শাসন একটি করে অমান্য করা চলল, প্রাচীন চেহারার একটু একটু করে বদল শুরু হল, মধূসূদন-দ্বিজেন্দ্রলাল-রবীন্দ্রনাথের মতো কবির হাতে পড়ে নানা রূপের পয়ার তৈরি হতে লাগল। ৮+৬ মাত্রার নির্দিষ্ট মাপের ছোটো পয়ারের পাশাপাশি এল ৮+১০ মাত্রার বড়ো মাপের মহাপয়ার, মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান রীতির একঘেয়েমি কাটিয়ে গড়ে উঠল দলবৃত্ত আর কলাবৃত্ত রীতির পয়ার, ২-চরণের বাঁধন ছিড়ে ভাব মুক্তি খুঁজে পেল প্রবহমান আর মুক্তক পয়ারে। এমনি করে প্রাচীন পরিচয়ের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এল 'পয়ার' নামের একটি আধুনিক ছন্দোবন্ধ।

৩৬.৪ সারাংশ-১

ছন্দরীতি হল ছন্দের প্রকৃতি, ভেতরকার পরিচয় **ছন্দোবন্ধ** ছন্দের আকৃতি—বাইরের পরিচয়। ছন্দরীতি নির্ভর করে দলের মাত্রা আর মাত্রাবিন্যাসের ওপর, 'ছন্দোবন্ধ' নির্ভর করে পর্বের মাপ আর পর্বনিব্যাসের ওপর।

পয়ার একটি প্রাচীন ছন্দোবন্ধ। কিন্তু, রূপের বৈচিত্র্য নিয়ে 'পয়ার' ক্রমশ আধুনিক হয়ে উঠেছে। তবে বহাল রেখেছে তার ৮+৬ মাত্রার প্রাচীন শরীরটি। প্রাচীন পয়ারে ৪টি শর্ত—স্তবকে ২টি চরণ, চরণশেষে মিল, প্রতি চরণে ২টি করে পর্ব, ৮+৬ মাত্রার/এ পয়ারের একমাত্র ছন্দরীতি মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান।

আধুনিক পয়ার বৈচিত্র্য পেল আয়তন ছন্দরীতি আর গতিভঙ্গির দিক থেকে। ৮+৬ মাত্রার নির্দিষ্ট আয়তনের পাশে এল ৮+১০ মাত্রার 'বড়ো পয়ার' বা 'মহাপয়ার'। মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান ছন্দরীতির পাশাপাশি তৈরি হতে লাগল দলবৃত্ত (শ্বাসাঘাতপ্রধান) আর কলাবৃত্ত (ধ্বনিপ্রধান) রীতির পয়ার। যে পয়ারে ভাবের গতি ছিল একটি-দুটি চরণে বন্ধ—'অপ্রবহমান', তা ক্রমশ 'প্রবহমান' হল ঐ সীমানা পেরিয়ে। চরণে ৮ + ৬ বা ৮+১০ মাত্রার নির্দিষ্ট ছকও এরপর ভেঙে যেতে লাগল। একটি চরণকে ছোটো-বড়ো নানা ছত্রে সাজিয়ে তৈরি করা স্তবকে পয়ারকে চিনতে হল সবচেয়ে বড়ো চরণের মাপ দেখে। সে মাপ ৮ + ৬ বা ৮ + ১০, স্তবকের অন্য সব চরণ ৬, ৮ বা ১০-মাত্রার হতে পারে, (যা পয়ার চরণের একটি পর্ব)। এমনি করে তৈরি হল **'মুক্তক' পয়ার**।

৩৬.৫ অনুশীলনী—১

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখার পর ২১৮ পৃষ্ঠার উত্তর-সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১. (ক) কাকে বলে, লিখুন ঃ মহাপয়ার, অপ্রবহমান পয়ার।

(খ) প্রবহমান পয়ার আর মুক্তক — এদের মধ্যে কোথায় মিল কোথায় পার্থক্য, বুঝিয়ে দিন।

২. (ক) কমপক্ষে ২টি ছত্রের ২টি করে দৃষ্টান্ত লিখুন ঃ

কলাবৃত্ত পয়ার, প্রবহমান পয়ার, মহাপয়ার।

(খ) আধুনিক পয়ারের কী কী রূপ, লিখুন।

৩. (ক) নীচের দৃষ্টান্তে প্রবহমানতা আছে কিনা, বুঝিয়ে লিখুন ঃ

(i) কী স্বপ্নে কাটালে তুমি দীর্ঘ দিবানিশ,
অহল্যা, পাষাণরূপে ধরাতলে মিশি,

(ii) তাই যদি, তাই হোক, দুঃখ নাহি তায়।
তুলিব কুসুম আমি অনন্তের কূলে।

(খ) নীচের দৃষ্টান্তে পয়ারের কোন রূপ রয়েছে, লিখুন ঃ

(i) সমুখে অজানা পথ ইঙ্গিত মেলে দেয় দূরে

(ii) চারদিকে নীল সাগর ডাকে অন্ধকারে শুনি ;

(iii) বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে।

(iv) তাই তন্দ্রা নাহি আর
চক্ষে তব, তাই বক্ষ জুড়ি সদা শঙ্কা, সদা আশা,
সদা আন্দোলন ; তাই উঠে বেদমন্ত্রসম ভাষা

৩৬.৬ মূলপাঠ-২ ঃ অমিত্রাক্ষর

'প্রবহমান পয়ার'-এর কথায় ফিরে চলু। এখানে চরণের মাপ সাধারণত ৮+৬ (মহাপয়ার হলে ৮+১০) মাত্রা, ভাব বা বক্তব্য ২-চরণের সীমানা পেরিয়ে যায়, চরণশেষের মিল সাধারণত থাকে, না-থাকলেও চলে। এই চরশেষের মিল-না-থাকা প্রবহমান প্রবোধচন্দ্র বলতেন অমিল প্রবহমান পয়ার। এই পয়ারেরই সবচেয়ে পরিচিতি নাম **অমিত্রাক্ষর**। আর, বাংলা কবিতায় শরীরে 'অমিত্রাক্ষর'-এর পোষাকটি প্রথম পরিয়ে দিলেন মধুসূদন দত্ত, তাঁর তিলোত্তমাসম্ভবকাব্যে মেঘনাদবধকাব্যে বীরাঙ্গানাকাব্যে। মেঘনাদবধকাব্যের শুরু কীভাবে লক্ষ করুন ঃ

সম্মুখ সমরে পড়ি, । বীরচূড়ামণি ॥ = ৮ + ৬
বীরবাহু চলি যবে । গেলা যমপুরে ॥ = ৮+ ৬
অকালে, কহ, হে দেবি । অমৃতভাষিণি, ॥ = ৮ + ৬
কোন্ বীরবরে বরি । সেনাপতি-পদে ॥ = ৮ + ৬
পাঠাইলা রণে পুনঃ । রক্ষঃ কুলনিধি ॥ = ৮ + ৬
রাঘবারি ? . . . . . (দৃষ্টান্ত - ১)

পদ্য উচ্চারণের অভ্যাস থেকে আপনারা সহজেই আন্দাজ করছেন—ওপরের স্তবকটির প্রতিটি ছত্রের মাঝখানে ১টি অর্ধযতি, ছত্রশেষে পূর্ণযতি। যতিস্থাপনের পর যে ৫টি চরণ পাওয়া গেল, তার প্রত্যেকটির মাপ

৮ + ৬ মাত্রা। স্তবকটিতে, ২-চরণের সীমানা পেরিয়ে তো বটেই, এমনকী ৫টি চরণে প্রবাহিত হতে হতে ষষ্ঠ চরণ ছুঁয়ে একটি ভাব সম্পূর্ণ হয়েছে। উদ্ধৃত স্তবকটির ছন্দোবন্ধ নিঃসন্দেহে প্রবহমান পয়ার। এবারে দেখুন, চরণশেষে মিল নেই কোনো জোড়া-চরণে (মনি-পুরে, যিণি-পদে, নিধি)। অতএব, স্তবকটি প্রবোধচন্দ্রে অমিল প্রবহমান পয়ার, আমাদের 'অমিত্রাক্ষর'।

প্রতি জোড়া-চরণের শেষে মিল থাকলেই যদি পদ্যকে বলি 'মিত্রাক্ষর', তাহলে মিল না-থাকা যেকোনো পদ্যকেই তো বলতে পারি 'অমিত্রাক্ষর', তা সে পয়ার হোক বা না-হোক প্রবহমান হোক বা না-হোক। কিন্তু, 'অমিত্রাক্ষর'-এর পরিচয় এ-রকম সংকীর্ণ নয়। 'অমিত্রাক্ষর' হবার জন্য কোনো পদ্যের অন্ততপক্ষে এই ৪টি গুণ থাকা জরুরি ঃ

(১) প্রতিটি ছত্রই একটি করে চরণ।

(২) প্রতিটি চরণের মাপ ৮+৬ (বা ৮+১০) মাত্রার।

(৩) একটি ভাব বক্তব্যের ২-চরণের সীমানা পেরিয়ে যাওয়া।

(৪) চরণশেষে কোনো মিল না-থাকা।

প্রথম ২টি গুণ থাকলেই পদ্য হয় পয়ার, তৃতীয় গুণটির জোরে তা হয়ে ওঠে প্রবহমান পয়ার, চতুর্থ গুণটি তাকে করে দেয় অমিল প্রবহমান পয়ার বা 'অমিত্রাক্ষর'।

একটি দৃষ্টান্ত দেখুন —

ইন্দ্রানী নামেতে দেশে। পূর্বাপর স্থিতি।॥ = ৮ + ৬

দ্বাদশ তীর্থেতে যথা। বৈসে ভাগীরথী॥ = ৮ + ৬ (দৃষ্টান্ত-২)

এখানে ২টি ছত্র। প্রতি ছত্রের শেষে পূর্ণযতি, অতএব প্রতিটি ছত্রই একটি করে চরণ। প্রতিটি চরণ ৮ + ৬ মাত্রার। সন্দেহ নেই, দৃষ্টান্তটি পয়ারের। এর অন্তর্গত বক্তব্যটি ২টি চরণের মধ্যেই সম্পূর্ণ, ২-চরণের সীমানা তাকে পেরোতে হয়নি। তাই পয়ারটি প্রবহমান হল না, এই কারণে 'অমিত্রাক্ষর' হবার সম্ভাবনাও তার তৈরি হল না। ধরা যাক, চরশেষের মিলটুকু মুছে দিয়ে পয়ারটিকে 'অমিল' করে দেওয়া হল এইভাবে—

ইন্দ্রানী নামেতে দেশ পূর্বাপর স্থিতি।

দ্বাদশ তীর্থেতে যথা ভাগীরথী বৈসে॥

পয়ারটি এখন 'মিত্রাক্ষর' রইল না, 'অমিত্রাক্ষর'ও হল না, হয়ে রইল শুধু 'অমিল' পয়ার। কেননা, 'অমিত্রাক্ষর' হবার জন্য আবশ্যক তৃতীয় গুণটি (বক্তব্যের ২-চরণের সীমানা পেরনোর সাহস) এখনো সে অর্জন করে নি। এবার দেখুন নীচের দৃষ্টান্তটি—

ধবল নামেতে গিরি। হিমাদ্রির শিরে—॥ = ৮ + ৬

অভ্রভেদী, দেব-আত্মা,। ভীষণ দর্শন ;॥ = ৮ + ৬ (দৃষ্টান্ত-৩)

এটি 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র প্রথম ২চি চরণ। 'অমিত্রাক্ষর'-এর স্রষ্টা মধুসূদনের হাতে শুরুটা এ-রকমই হল। কিন্তু একটি বক্তব্য বা ভাব স্থির হয়ে রইল ২টি চরণেরই সীমানায়। অতএব, এ দৃষ্টান্তটি একান্তই 'অমিল' পয়ারের, 'অমিত্রাক্ষরে' নয়।

একই কাব্যের কয়েকটি ছত্র পেরিয়ে দেখুন—

যেন মরকতময় । কনককিরীট ॥	= ৮ + ৬
না পরে এ গিরি, সবে । করি অবহেলা, ॥	= ৮ + ৬
বিমুখ পৃথিবীপতি । পৃথ্বীসুখ যেন ॥	= ৮ + ৬
জিতেন্দ্রিয় !.....	(দৃষ্টান্ত - ৪)

এ দৃষ্টান্ত নিতান্ত 'অমিল' পয়ারের নয়। এর সঙ্গে লেগেছে তৃতীয় গুণটির ছোঁয়া। লক্ষ করুন, এর নিহিত বক্তব্য পর পর ৩টি চরণ অতিক্রম করে চতুর্থ চরণে প্রবেশ করার সাহস দেখাল। এই সাহসের জোরেই এ পয়ার 'অমিত্রাক্ষর' হয়ে উঠল। তিলোত্তমাসম্ভবকাব্যের শুরু থেকে উদ্ধার-করা এই অংশটির সঙ্গে মিলিয়ে পড়ুন একটু আগে মেঘনাদবধকাব্যের শুরু থেকে নেওয়া অংশটুকু (সম্মুখ সমরে পড়ি...)। আন্দাজ করা যাবে, 'অমিত্রাক্ষরে'র তৃতীয় গুণটির (একটি বক্তব্যের ২-চরণের সীমানা পেরিয়ে যাওয়া) জোর কতটা বাড়ল, কীভাবে বাড়ল।

ভাবের বা বক্তব্যের সীমানা পেরিয়ে যাবার এই গুণটিকে সংক্ষেপে বলুন প্রবহমানতা। এর সঙ্গে ভাবুন ছেদ আর যতির পার্থক্যটি। ছেদেরে সঙ্গে অর্থের যোগ, যতির সঙ্গে ছন্দের—এটা গোড়া থেকেই আপনারা জানেন। এ-ও আপনাদের জানা, একটি ভাব বা বক্তব্য অর্থকে আশ্রয় করেই গড়ে ওঠে। সেই কারণে, ভাব বা বক্তব্যকে যেখানে অপূর্ণ রেখে একটুখানি থামতে হয় সেখানে পড়ে অর্ধচ্ছেদ, যেখানে তাকে সম্পূর্ণ করে পুরোপুরি থামতে হয় সেখানে পড়ে পূর্ণচ্ছেদ। অর্ধচ্ছেদের একমাত্র চিহ্ন কমা, (,), পূর্ণচ্ছেদের চিহ্ন দাঁড়ি (।) জোড়া-দাঁড়ি (॥) বিস্ময়চিহ্ন (!) প্রশ্নচিহ্ন (?) ড্যাস্ (—), কোলন (ঃ) সেমিকোলন (;)। অন্যদিকে, সমান সমান মাত্রার পরে নিয়মিত থামার জায়গায় পড়ে যদি—পর্বের পরে অর্ধযতি (।) চরণের পূর্ণযতি (॥)। যে ৪টি পয়ার-স্তবকের দৃষ্টান্ত এর আগে দেওয়া হল, তাদের প্রত্যেকটিতে যতির স্থান নির্দিষ্ট—৮-মাত্রায় অর্ধযতি, ১৪-মাত্রায় পূর্ণযতি। পয়ারে এ-রকমই হয়। কিন্তু, ছেদের স্থান কোথাও নির্দিষ্ট, কোথাও অনির্দিষ্ট।

লক্ষ করুন ঃ (১) দৃষ্টান্ত-২ আর দৃষ্টান্ত-৩ স্তবকে ভাব বা বক্তব্য ২-চরণেই বাঁধা, প্রবহমান নয়। ২টি স্তবকের প্রতিটি ছত্রেই পূর্ণচ্ছেদ-পূর্ণযতি ছত্রশেষে এক জায়গায় মিলেছে। এমনকী, অর্ধচ্ছেদ-অর্ধযতিও মিলেছে দৃষ্টান্ত-৩ স্তবকের দ্বিতীয় ছত্রে। অর্থাৎ, পূর্ণযতির সঙ্গে পূর্ণচ্ছেদেরও স্থান এসব ক্ষেত্রে ছত্রশেষে নির্দিষ্ট (১৪-মাত্রায়)।

(২) এবার তাকান দৃষ্টান্ত-৪ আর দৃষ্টান্ত-১ স্তবকের দিকে। স্তবকদুটিতে ভাব ২-চরণের সীমানা পেরিয়ে প্রবহমান ২টি স্তবকের মধ্যে কেবলমাত্র দৃষ্টান্ত-৪ স্তবকের দ্বিতীয় ছত্রে আর দৃষ্টান্ত-১ এর তৃতীয় ছত্রে অর্ধচ্ছেদ-পূর্ণযতির মিলন, আর সব জায়গাতেই ছেদ আর যতির বিচ্ছেদ। অর্থাৎ, ছেদ-যতি আর কোথাও এক জায়গায় মেলেনি।

তাহলে, ওপরের (১)-অনুচ্ছেদ থেকে বুঝতে পারি, ভাব যেখানে ২-চরণের সীমানায় বাঁধা, ছেদ-যতির সেখানে মিলন। অন্ততপক্ষে পূর্ণচ্ছেদ-পূর্ণযতি ছত্রশেষে মিলবেই। আর, (২)-অনুচ্ছেদ থেকে জানা গেল, ভাব যেখানে প্রবহমান, ছেদ আর যতির সেখানে বিচ্ছেদ। অন্ততপক্ষে পূর্ণচ্ছেদ-পূর্ণযতি কখনো মিলবে না। অর্থাৎ, পয়ার প্রবহমান হলে পয়ার-স্তবকে ছেদ-যতির বিচ্ছেদ থাকবেই। 'অমিত্রাক্ষর' মূলত প্রবহমান পয়ার, অতএব,

এখানেও ছেদ-যতির বিচ্ছেদ অনিবার্য। তবে এটা কোনো পদ্যের 'অমিত্রাক্ষর' হবার পক্ষে বাড়তি কোনো গুণ নয়, এটা প্রবহমানতরাই একটা লক্ষণ। এ লক্ষণ চোখ দিয়েও চেনা যায় ছেদ-যতির চিহ্নি দেখে।

আপনারা জানেন, পয়ারের দু-রকম আয়তন—৮+৬ মাত্রা আর ৮+১০ মাত্রা। ৮ + ৬ মাত্রার ছোটো পয়ার কীভাবে অমিত্রাক্ষর হয়ে ওঠে, দেখলেন। এবারে দেখুন ৮ + ১০ মাত্রার বড়ো পয়ারের অমিত্রাক্ষর-রূপ। একটি দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের 'প্রান্তিক' কাব্য থেকে নেওয়া হল—

পুরস্কার প্রত্যাশায়। পিছু ফিরে বাড়ায়ো না হাত ॥ = ৮ + ১০
যেতে যেতে ; জীবনে যা। কিছু তব সত্য ছিল দান ॥ = ৮ + ১০
মূল্য চেয়ে অপমান। করিয়ো না তারে ; এ জনমে ॥ = ৮ + ১০
শেষ ত্যাগ হোক তব। ভিক্ষাঝুলি, নববসন্তের ॥ = ৮ + ১০
আগমনে . . . . . .

৮+১০ মাত্রার মাপের এক-একটি বড়ো পয়ার বা মহাপয়ারের চরণ ২টি করে যতিচিহ্ন নিয়ে এক-একটি ছত্র জুড়ে রয়েছে। লক্ষ করুন ঃ প্রথম চরণে কোনো ছেদচিহ্ন নেই, দ্বিতীয় চরণে পর্ণচ্ছেদ (;) ৪-মাত্রায়, তৃতীয় চরণে পূর্ণচ্ছেদ। (;) ১৪-মাত্রায়, চতুর্থ চরণে অর্ধচ্ছেদ (,) ১২-মাত্রায়। অথচ, যতিচিহ্ন প্রতি চরণে ৮ আর ১৪-মাত্রায় নির্দিষ্ট। অর্থাৎ, প্রতিটি ছেদই যতি থেকে বিচ্ছিন্ন। ছেদ-যতির এই বিচ্ছেদ থেকে ধরা পড়ে স্তবকটিরে অন্তর্গত ভাবের প্রবহমানতা। ভাব প্রবাহিত হয়ে চলেছে আগের চরণ থেকে পরের চরণে, থেমে যাচ্ছে চরণের যেখানে-সেখানে। এবার প্রতিটি চরণের শেষপ্রান্তের দিকে তাকিয়ে দেখুন—মিল নেই (হাত্-দান্ নমে-তের্)। অতএব, ৮ + ১০ মাত্রার ৪টি চরণ নিয়ে তৈরি পয়ার-স্তবকটি ছেদ-যতির বিচ্ছেদ আর চরণশেষে মিলের অভাব নিয়ে অমিত্রাক্ষর হয়ে উঠেছে।

আয়তনের দিক থেকে ছোটো পয়ার আর বড়ো পয়ার—দু-রকম অমিত্রাক্ষরই আপনারা দেখলেন। কিন্তু রীতির দিক থেকে প্রতিটি পয়ারই ছিল মিশ্রবৃত্ত (বা তানপ্রধান)। একমাত্র মিশ্রবৃত্ত রীতির হাত ধরেই বাংলা কবিতার অমিত্রাক্ষর পয়ার শতায়ু হয়েছে। কলাবৃত্ত (বা ধ্বনিপ্রধান) অমিত্রাক্ষর কোনোকালে চালু হয়নি। তবে দলবৃত্ত রীতির অমিত্রাক্ষর চালু না হলেও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ একটিমাত্র নমুনা তৈরি করে খানিকটা চমক উপহার দিলেন ছন্দ-ভাবুক বাঙালিকে। নমুনাটি পড়ুন—

যুদ্ধ তখন সাঙ্গ হল। বীরবাহু বীর যবে ॥ = ৮ + ৬
বিপুল বীর্য দেখিয়ে হঠাৎ। গেলেন মৃত্যুপুরে ॥ = ৮ + ৬
যৌবনকাল পার না হতেই। কত মা সরস্বতী, ॥ = ৮ + ৬
অমৃতময় বাক্য তোমার,। সেনাধ্যক্ষপদে ॥ = ৮ + ৬
কোন্ বীরকে বরণ করে। পাঠিয়ে দিলেন রণে ॥ = ৮ + ৬
রঘুকুলের পরম শত্রু,। রক্ষঃকুলের নিধি ॥ = ৮ + ৬

একটু আগে অমিত্রাক্ষরের প্রথম দৃষ্টান্তে মেঘনাদবধকাব্যের যে ৬টি ছত্র ব্যবহার করা হয়েছে, (সম্মুখ

সমরে পড়ি.....) তার সঙ্গে মিলিয়ে পড়ুন ওপরের ৬টি ছত্র। লক্ষ করুন—২টি স্তবকের অন্তর্গত বক্তব্য হুবহু এক, ভাষা দু-রকম। দৃষ্টান্ত-১ এর ভাষা সাধু, দৃষ্টান্ত-৫ এর চলতি। ২টি স্তবকের ছন্দরীতি মিলিয়ে দেখুন—দৃষ্টান্ত-১ এ মিশ্রবৃত্ত, দৃষ্টান্ত-৫ এ দলবৃত্ত। এবারে ২টি স্তবকেই দলের মাথায় মাত্রা বসিয়ে দেখুন, প্রতিটি ছত্রে আছে ১৪ মাত্রা। দৃষ্টান্ত-১ এ যতি স্থাপন করে আগেই দেখা গেছে, স্তবকটি ৮ + ৬ মাত্রার ৫টি ছোটো পয়ারের চরণে তৈরি। দৃষ্টান্ত-৫ দলবৃত্ত। অতএব এর প্রতিটি পূর্ণপর্ব ৪ মাত্রার হবার কথা, প্রতিটি চরণে ১৪-মাত্রার বিভাজন হবার কথা ৪ + ৪ + ২। প্রবোধচন্দ্র এর বদলে ১৪-মাত্রাকে ৮ + ৬ মাথায় ভাগ করে বলেছেন, দৃষ্টান্ত-৫ এর স্তবকটিও পয়ারের। তাহলে মেনে নিন, এটি দলবৃত্ত রীতির পয়ার। এখন দেখুন, স্তবকটির শরীরে ছেদ-যতি কোথায় এক বিন্দুতে মিলেছে, আর কোথায় বিচ্ছিন্ন। ছেদ-যতির মিলন-স্থল এই কটি—৩য় চরণে পূর্ণচ্ছেদ-অর্ধচ্ছেদ-পূর্ণযতি, চতুর্থ চরণে অর্ধচ্ছেদ-অর্ধযতি, ষষ্ঠ চরণে অর্ধচ্ছেদ-অর্ধযতি আর পূর্ণচ্ছেদ-পূর্ণযতি। দেখা গেল, প্রথম ৫টি চরণে পূর্ণচ্ছেদ-পূর্ণযতির মিলন-বিন্দু একটিও নেই। এর অর্থ, স্তবকটির শরীরে রয়েছে ছেদ-যতির বিচ্ছেদ, ভেতরে চলছে ভাবের প্রবাহ। এর সঙ্গে মিলেছে চরণশেষে মিলের অভাব (যবে-পুরে স্বতী-পদে রণে-নিধি)। অর্থাৎ অমিত্রাক্ষর হয়ে ওঠার সব-কটি গুণই এ-স্তবকে দেখতে পেলেন। অথচ, স্তবকটি কিন্তু দলবৃত্ত রীতিতেই লেখা। এখনো পর্যন্ত এটিই দলবৃত্ত রীতিতে লেখা অমিত্রাক্ষরের একমাত্র পরিচিত দৃষ্টান্ত।

জেনে রাখুন, বাংলা কবিতায় কলাবৃত্তে অমিত্রাক্ষর হয়নি, দলবৃত্তে অমিত্রাক্ষর চলেনি, আর মিশ্রবৃত্তে অমিত্রাক্ষরের শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে ৪০ বছর আগে।

৩৬.৭ সারাংশ-২

চরণশেষের মিল-না-থাকা প্রবহমান পয়ারকে প্রবোধচন্দ্র বলেন 'অমিল প্রবহমান পয়ার'। এই পয়ারেরই অন্য নাম 'অমিত্রাক্ষর'। অমিক্ষাররে প্রথম কবি মধুসূদন দত্ত, 'প্রথম কাব্য 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'। একটি পদ্যের পক্ষে 'অমিত্রাক্ষর' হবার মূল শর্ত প্রতিটি ছত্রকে ৮+৬ (বা ৮+১০) মাত্রার মাপের চরণ হিসেবে পাওয়া এবং চরণশেষে মিল না-রাখা। কিন্তু, সবচেয়ে জরুরি শর্ত—একটি ভাব বা বক্তব্যের ২-চরণের সীমানা পেরিয়ে যাওয়া। এই শর্তের জোরেই মধুসূদনের 'তিলোত্তমাসম্ভবকাব্যে'র তুলনায় 'মেঘনাদবধকাব্যে'র অমিত্রাক্ষর অনেক বেশি সমার্থক। ভারের এই সীমানা-পেরোনা বা প্রবহমানতার লক্ষণ চরণ-শেষে ছেদ না-থাকা, চরণের মাঝখানেও ৮-মাত্রার শেষে অর্ধযতির সঙ্গে অর্ধচ্ছেদ না-থাকা। ছেদ-যতির বিচ্ছেদে প্রবহমানতা, মিলনে প্রবহমানতার অভাব।

মধুসূদনের 'অমিত্রাক্ষরে' কেবল ৮+৬ মাত্রার পয়ার, ৮+১০ মাত্রার বড়ো পয়ারের কাঠামোয় তৈরি 'অমিত্রাক্ষর' রয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'প্রান্তিক' কাব্যে। 'অমিত্রাক্ষর'-এর ছন্দরীতি মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান। একমাত্র ব্যতিক্রম রবীন্দ্রনাথের তৈরি ৬-চরণের একটি দলবৃত্ত (শ্বাসাঘাতপ্রধান) রীতির স্তবক, যা 'মেঘনাদবধকাব্যে'র প্রথম ৬টি চরণের রূপান্তর—দলবৃত্ত রীতিতে 'অমিত্রাক্ষর' তৈরির পরীক্ষানিরীক্ষা।

৩৬.৮ অনুশীলনী—২

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখার পর ২১৮ পৃষ্ঠার উত্তর-সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১. একটি অমিত্রাক্ষর স্তবক বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দিন যে ঐ স্তবকে অমিত্রাক্ষর ছন্দোবন্ধের সবকটি গুণই আছে।

২. নীচের দৃষ্টান্ত অমিত্রাক্ষরের কিনা, কারণ জানিয়ে লিখুন ঃ

(ক) ধবল নামেতে গিরি হিমাদ্রির শিরে—
অভ্রভেদী, দেব-আত্মা, ভীষণ দর্শন ;

(খ) যেন মরকতময় কনককিরীট
না পরে এ গিরি, সবে করি অবহেলা,
বিমুখ পৃথিবীপতি, পৃথ্বীসুখে যেন
জিতেন্দ্রিয় !

(গ) বৃষ্টিক্লান্ত বহুদীর্ঘ লুপ্ততরাশশী
আষাঢ়সন্ধ্যায়, ক্ষীণ দীপালোকে বসি
ওই ছন্দ মন্দ মন্দ করি উচ্চারণ
নিমগ্ন করেছে নিজ বিজনবেদন।

(ঘ) যুদ্ধ তখন সাঙ্গ হল বীরবাহু বীর যবে
বিপুল বীর্য দেখিয়ে হঠাৎ গেলেন মৃত্যুপুরে
যৌবনকাল পার না হতেই।

৩. নীচের দৃষ্টান্তে কোন ছত্রে কত মাত্রার পরে ছেদ-যতির বিচ্ছেদ আর মিলন, লিখুন ঃ

শুনেছি সরযুতীরে বসতি তাহার—
ক্ষুদ্র নর। তব হৈমসিংহাসন-আশে
যুঝিছে কি দাশরথি ? বামন হইয়া
কে চাহে ধরিতে চাঁদে ?
স্তবকটি অমিত্রাক্ষর কিনা জানান।

৩৬.৯ মূলপাঠ—৩

আপনারা দেখলেন, 'অমিত্রাক্ষর' পয়ারেরই একটি বিশেষ রূপ। এবারে দেখবেন, চতুর্দশপদীর জন্মও মূলত পয়ার-বন্ধেরই আর-একটি বিশেষ রকমের প্রয়োগ থেকে। আবার, অমিত্রাক্ষরে'র মতো 'চতুর্দশপদী'ও বাংলা সাহিত্যে এসেছে য়ুরোপীয় ছন্দোবন্ধের আদলে। দুটি ছন্দোবন্ধই অনেকটা দেশি টবে ফুটে-ওঠা বিদেশি ফুলের মতো, এদেশে ফুটিয়েছিলেন মধুসূদন দত্ত। ইতালীয়—ইংরেজি-ফরাসি সাহিত্যে যে ছন্দোবন্ধের নাম সনেট, বাংলায় তারই নাম হল **চতুর্দশপদী**। তবে, বিকল্প নাম হিসেবে 'সনেট' শব্দটিও বাংলায় চালু।

চোদ্দ শতকের ইতালীয় কবি ফ্রান্সিস্কো পেত্রার্কা সনেটের প্রথম কবি। ষোলো শতকের ফরাসি কবি ক্লেঁসে মারোর প্রবর্তনায় শুরু হল ফরাসি সনেটের চর্চা। প্রায় একই সময়ে ইংরেজি সনেট-চর্চা শুরু হলেও সতেরো শতকের কবি সেক্স্পিয়ারের হাতেই গড়ে উঠল স্বতন্ত্র রীতির সেক্সপিরীয় সনেট। এমনি করে তৈরি হল য়ুরোপীয় সনেটের ৩টি আদর্শ—পেত্রার্কীয় ফরাসি আর সেক্সপিরীয়। এই ৩টি আদর্শই মধুসূদনের মাধ্যমে ক্রমশ বাংলা সনেট বা 'চতুর্দশপদী'র আশ্রয় হয়ে উঠল।

'চতুর্দশপদী' কথাটির সরল অর্থ '১৪টি পদ দিয়ে তৈরি' কবিতা। কিন্তু, বাংলায় যে ধরনের কবিতা 'চতুর্দশপদী' নামে চিহ্নিত, তার শরীর ১৪টি চরণ দিয়ে গড়া, ১৪টি পদ দিয়ে নয়। 'পদ' কথাটির বিশেষ অর্থ এখানে 'চরণ'। এক সময়ে কোনো কোনো ছন্দশাস্ত্রে অবশ্য 'পদ' আর 'চরণ' একই অর্থে প্রয়োগ করা হত। এই ১৪টি চরণের সমষ্টি হওয়া 'চতুর্দশপদী' কবিতার প্রথম শর্ত, তবে একমাত্র নয়। একটি কবিতাকে 'চতুর্দশপদী' হবার জন্য কমপক্ষে আরো ৪টি শর্ত মানতেই হয় ঃ

(১) প্রতিটি চরণ হবে পয়ারের—৮+৬ মাত্রার ছোটো পয়ার বা ৮+১০ মাত্রার বড়ো পয়ার। বাংলা সনেট বা 'চতুর্দশপদী'র প্রথম কবি মধুসূদনের মোট ১০৮টি কবিতার প্রতিটি চরণ ৮+৬ মাত্রার ছোটো পয়ার। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ আর মোহিতলাল মজুমদার ৮+১০ মাত্রার বড়ো পয়ারও প্রয়োগ করেছিলেন 'চতুর্দশপদী'তে।

(২) গোটা কবিতাই লেখা হবে কেবল মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান রীতিতে।

(৩) স্তবক-বিভাগ হবে নির্দিষ্ট ছকে। সে ছক তৈরি হবে এই ৩টি আদর্শের যেকোনো ১টিতে—পেত্রার্কীয় ফরাসি সেক্সপিরীয়।

পেত্রার্কীয় আদর্শে একটি কবিতায় স্তবক থাকবে ২টি—প্রথমটি ৮-চরণের (অষ্টক), দ্বিতীয়টি ৬-চরণের (ষট্ক)। **ফরাসি** আদর্শে ৩টি স্তবক—প্রথম স্তবক ৮-চরণের (অষ্টক), দ্বিতীয়টি ২-চরণের (যুগ্মক), তৃতীয়টি ৪-চরণের (চতুষ্ক)। **সেক্স্পিরীয়** আদর্শে স্তবকের সংখ্যা ৪ — প্রথম ৩টি ৪-চরণের (চতুষ্ক), শেষেরটি ২-চরণের (যুগ্মক)।

এ সব বিভাগ রূপের দিক থেকেও, ভাবের দিক থেকেও।

(৪) চরণশেষে মিল (অন্ত্যমিল) থাকবে। তবে সে মিল প্রতি ২-চরণের একঘেয়ে অন্ত্যমিল নয়। মিল তৈরি হবে নির্দিষ্ট ছকে, সে ছক উঠে আসবে নীচের ৩টি য়ুরোপীয় আদর্শের যেকোনো ১টি থেকে।

পেত্রার্কীয় মিল—কখখখ-কখখক চছজ-চছজ = অষ্টক + ষট্ক

ফরাসি মিল—কখখখ-কখখক গগ চছচছ = অষ্টক + যুগ্মক + চতুষ্ক

সেক্স্পিরীয় মিল—কখকখ-গঘগঘ পফপফ চচ = চতুষ্ক + চতুষ্ক + চতুষ্ক + যুগ্মক

চরণের শেষ দলের (বা অক্ষরের) উচ্চারণ থেকেই সাধারণ অন্ত্যমিল তৈরি হয়। ক খ গ ঘ চ ছ জ প ফ—এক-একটি বর্ণ 'চতুর্দশপদী' এক-একটি চরণের শেষ দলের উচ্চারণের চিহ্ন। পরের দৃষ্টান্তগুলিতে চরণশেষে এসব চিহ্ন পরপর সাজিয়ে মিলের ছক নিজেরাই বুঝে নিতে পারবেন। তখন দেখবেন, প্রতিটি 'চতুর্দশপদী'র মিলের ছক কোনো-না-কোনো আদর্শের আদলে তৈরি। তবে দুটি-একটি এমন দৃষ্টান্তও চোখে পড়বে, যেখানে নির্দিষ্ট আদর্শ পুরোপুরি মানা হয় নি। বাঙালি কবিরা 'চতুর্দশপদী' লিখতে গিয়ে একটু স্বাধীনতা ভোগ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি কবিতাই কেবল ৭টি যুগ্মকের সমষ্টি—অর্থাৎ, ২-চরণের ৭টি অন্ত্যমিল সাজানো এক-একটি 'চতুর্দশপদী'।

অতএব, একটি ১৪-চরণের কবিতা ওপরের ৪-টি শর্ত মানলে তবেই হয়ে ওঠে 'চতুর্দশপদী'। এর অন্তর্গত ভাব প্রবহমান হতে পারে, না-ও হতে পারে। অর্থাৎ, ছেদ-যতির মিলন থাকতে পারে, না-ও থাকতে পারে।

এবারে পর পর ৩টি দৃষ্টান্ত সতর্কতার সঙ্গে পড়ুন। লক্ষ করুন, কীভাবে এক-একটি কবিতা 'চতুর্দশপদী' হয়ে উঠেছে।

দৃষ্টান্ত-১.

কমলে কামিনী আমি হেরিনু স্বপনে	ক	অষ্টক
কালিদহে। বসি বামা শতদল-দলে	খ	
(নিশীথে চন্দ্রিমা যথা সরসীর জলে	খ	
মনোহরা !) বাম করে সাপটি হেলনে	ক	
গজেশে, গ্রাসিছে তারে উগরি সঘনে।	ক	
গুঞ্জরিছে অলিপুঞ্জ অন্ধ পরিমলে,	খ	
বহিছে দহের বারি মৃদু কলকলে।	খ	
কার না ভোলে রে মন ঃ, এ হেন ছলনে !	ক	
কবিতা-পঙ্কজে রবি, শ্রীকবিকঙ্কণ,	চ	ষট্‌ক
ধন্য তুমি বঙ্গভূমে ! যশঃ-সুধাদানে	ছ	
অমর করিলা তোমা অমরকারিণী	জ	
বাগ্‌দেবী ! ভোগিলা দুখ জীবনে, ব্রাহ্মণ,	চ	
এব কে না পূজে তোমা, মজি তব গানে ?	ছ	
বঙ্গ-হৃদ-হ্রদে চণ্ডী কমলে কামিনী ॥	জ	[কমলে কামিনী ঃ মধুসূদন দত্ত]

১৪-চরণের এই কবিতার প্রতিটি চরণ উচ্চারণ করে করে মনে মনে অর্ধযতি-পূর্ণযতির জায়গা খুঁজে বের করুন, দলের মাত্রা আন্দাজ করুন, তা থেকে এক-একটি পর্বের মাপ স্থির করুন। দেখবেন, মুক্তদল যেখানেই থাকুক ১-মাত্রার, রুদ্ধদল শব্দের শুরুতে বা মাঝখানে থাকলে ১-মাত্রার, শেষে থাকলে ২-মাত্রার হচ্ছে। বোঝা গেল কবিতাটি মিশ্রবৃত্ত রীতির ছন্দে লেখা। যতির অবস্থান দেখে এও বোঝা যাবে, প্রতিটি চরণ ৮+৬ মাত্রার ছোটো পয়ারে বাঁধা।

এবারে লক্ষ করুন, কবিতাটির স্তবক-বিভাগ আর অন্ত্যমিলের ছক ওপরে-নীচে লেখা চরণশেষের বর্ণ-চিহ্নগুলি পাশাপাশি সাজালে অন্ত্যমিলের এইরকম একটা ছক পাওয়া যাবে—

কখখক-কখখক চছজ-চছজ

একটু আগেই আপনারা দেখলেন, এটা পেত্রার্কীয় মিলের ছক। তাহলে ধরে নিতে পারেন, কবিতাটির স্তবক-বিভাগও হবে পেত্রার্কীয় আদর্শে। অর্থাৎ, এর স্তবক ২টি—প্রথমটি ৮-চরণের (অষ্টক), দ্বিতীয়টি ৬-চরণের (ষট্‌ক)। রূপের দিক থেকে কবিতাটি যে এ-রম ২টি স্তবকে ভাগ হয়ে আছে, তা বোঝা যায় অন্ত্যমিলের ছক থেকেই—

কখখক-কখখক চছজ-চছজ = অষ্টক্ + ষট্‌ক 'কখ' মিলদুটি ৪-বার ঘুরে ঘুরে এসে ৮-চরণের (অষ্টক) প্রথম স্তবকটি গড়ে তুলেছে। দ্বিতীয় স্তবক তৈরি হয়েছে 'চছজ' মিল-তিনটির ২-বারের আবর্তনে, ৬টি চরণ নিয়ে (ষট্‌ক)।

এবারে কবিতাটির অন্তর্গত বক্তব্য বা ভাবের দিকটা দেখুন। ৮-চরণের প্রথম স্তবকে 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যের মূলচরিত্র ধনপতি সদাগত-প্রসঙ্গ, ৬-চরণের দ্বিতীয় স্তবকে চণ্ডীমঙ্গালের কবি প্রসঙ্গ। অতএব, ভাবের দিক থেকেও ২টি স্তবকে কবিতাটি ভাগ হয়ে গেছে সহজেই।

ছেদ-যতির সম্পর্ক লক্ষ করুন। ছেদের যত্রতত্র প্রয়োগ (চরণের ৩, ৪, ৮, ১১, ১৪ মাত্রার পরে) ভাবের প্রবহমানতার লক্ষণ হয়ে আছে। পূর্ণচ্ছেদ-পূর্ণযতির মিলন ৫টি চরণের শেষে ঘটলেও বাকি ৯টি চরণেই তো বিচ্ছেদ। অতএব, কবিতাটি প্রবহমান পয়ারেই লেখা।

সব মিলিয়ে দাঁড়াল এই—সব শর্ত মেনে নিয়ে কবিতাটি পেত্রার্কীয় লেখা একটি 'চতুর্দশপদী'।

দৃষ্টান্ত-২.

নয়ন-গোলাপ তব করিতে উজ্জ্বল ক
বুল্‌বুলের সুরে আজি বেঁধেছি সেতার। খ
গাহিব প্রেমের গান পারসী কেতার খ
ফুলের মতন লঘু রঙিলা গজল। ক
যে সুর পশিয়া কানে চোখে আনে জল, ক
সে সুর বিবাদী জেনো মোর কবিতার। খ
মম গীতে নত তব চোখের পাতার খ
সীমান্তে রচিয়া দিব দু ছত্র কাজল। ক

বাজিয়ে দেখেছি ঢের বীণ ও রবাব, গ
পাইনি সে সুরে তব প্রাণের জবাব। গ

আজ তাই ছাড়ি যত ধ্রুপদ ধামার চ
টুট্‌কিতে রাখি সব আশা ভালোবাসা ছ
দরদ ঈষৎ আছে এ গীতে আমার— চ
সুরে ভাবে মিল আছে, দুই ভাসা-ভাসা। ছ

[গজল ঃ প্রমথ চৌধুরী]

এইমাত্র দৃষ্টান্ত-১ বিশ্লেষণ করলেন। একই পদ্ধতিতে দৃষ্টান্ত-২ বিশ্লেষণ করুন। দেখা যাবে, এ কবিতার ১৪টি চরণও আগের মতোই ৮+৬ মাত্রার ছোটো পয়ারে নিবদ্ধ, ছন্দরীতি মিশ্রবৃত্ত। অবশ্য, স্তবক-বিভাগ আর অন্ত্যমিলের ছকে একটুখানি ফারাক রয়েছে। এই ফারাকটি লক্ষ করুন—

কবিতা	মিলের ছক	স্তবক-বিভাগের ছক	য়ুরোপীয় আদর্শ
দৃষ্টান্ত-১	কখখক-কখখক চছজ-চছজ	অষ্টক + ষট্‌ক	পেত্রার্কীয়
দৃষ্টান্ত-২	কখখক-কখখক গগ-চছচছ	অষ্টক + যুগ্মক + চতুষ্ক	ফরাসি

২টি দৃষ্টান্তেই অষ্টক পুরোপুরি এক। কেবল, দৃষ্টান্ত-১ এর ষট্‌ক (৬টি চরণের দ্বিতীয় স্তবক) দু'-টুকরোয় ভেঙে দৃষ্টান্ত-২-এর যুগ্মক (২-চরণের দ্বিতীয় স্তবক) আর চতুষ্ক (৪-চরণের তৃতীয় স্তবক) তৈরি করেছে। এর ফলে দৃষ্টান্ত-২-এর কবিতায় স্তবক পেলাম ৩টি, দৃষ্টান্ত-১-এ ছিল ২টি স্তবক। ফারাক এইটুকুই। কিন্তু, এইটুকুতেই আদর্শের ফারাক ঘটে গেল অনেকখানি। দৃষ্টান্ত-২-এর আদর্শ ছিল পেত্রার্কীয়, দৃষ্টান্ত-৩-এর আদর্শ হয়ে গেল ফরাসি। স্তবক-বিভাগ আর মিলের ছক—দুদিক থেকেই এ কবিতায় পুরোপুরি ফরাসি আদর্শের ছাপ।

ধ্রুপদ-ধামার ছেড়ে লঘু গজলের সুর রচনার উদ্যোগ গোটা কবিতার বক্তব্য বা ভাব। এই ভাবটিকে ৩টি ভাগে ভাগ করে ৩টি স্তবকে কবি সাজালেন, সহায়ক হিসেবে পেলেন ফরাসি মিলের ছকটি। প্রথম স্তবকের অষ্টক লঘু গজলের সুরে সেতার বাঁধার কথা, দ্বিতীয় স্তবকের ২টি চরণে বীণা-রবারের ব্যর্থতার কথা, আর তৃতীয় স্তবকের চতুষ্কে অনিচ্ছার সঙ্গেই ধ্রুপদ-ধামার ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্তের কথা—স্তবক-বিন্যাসের এই পদ্ধতি পুরোপুরি ফরাসি সনেটের পদ্ধতি।

অতএব, দৃষ্টান্ত-২ এর কবিতাটি নিঃসন্দেহে ফরাসি আদর্শে লেখা একটি নিটোল 'চতুর্দশপদী'। ছেদ-যতির অবস্থানে প্রবহমানতার কোনো লক্ষণ কবিতায় নেই।

দৃষ্টান্ত-৩.

তবু মনে রেখো, যদি দূরে যাই চলি, ক
সেই পুরাতন প্রেম যদি এক কালে খ
হয়ে আসে দুরস্মৃত কাহিনী কেবলি— ক
ঢাকা পড়ে নব নব জীবনের জালে। খ

তবু মনে রেখো, যদি বড়ো কাছে থাকি, গ
নূতন এ প্রেম যদি হয় পুরাতন খ
দেখো না দেখিতে পায় যদি শ্রান্ত আঁখি- গ
পিছনে পড়িয়া থাকি ছায়ার মতন। ঘ

তবু মনে রেখো, যদি তাহে মাঝে মাঝে প
উদাস বিষাদভরে কাটে সন্ধ্যাবেলা ফ
অথবা শারদ প্রাতে বাধা পড়ে কাজে প
অথবা বসন্ত-রাতে থেমে যায় খেলা ফ

তবু মনে রেখো, যদি মনে পড়ে আর চ
আঁখিপ্রান্তে দেখা নাহি দেয় অশ্রুধারা চ

[তবু/ মানসী ঃ রবীন্দ্রনাথ]

দৃষ্টান্ত-১-এর পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করুন। ১৪-চরণের এ কবিতাতেও পাবেন ৮ + ৬ মাত্রার ছোটো পয়ার, মিশ্রবৃত্ত রীতি। তবে, পুরোপুরি অন্যরকম এর মিলের ছক আর স্তবক-বিভাগ। মিলের ছক **কখকখ গঘগঘ পফপফ চচ ;** ৩টি চতুষ্ক আর ১টি যুগ্মক—এই ৪টি স্তবকে ভাগ হয়ে আছে কবিতাটি। রূপের পাশাপাশি ভাবের দিকটাও দেখুন। 'তবু মনে রেখো' কথাটি দিয়ে শুরু-হওয়া প্রতিটি স্তবকে একটি করে আবেদনের করুণ সুর বাজছে। এমনি করি কবিতাটির ভাগ হল সেক্স্পিরীয় মিলের ছকে ৪টি স্তবকে। অতএব, এটি নিখুঁত সেক্সপিরীয় আদর্শে তৈরি 'চতুর্দশপদী'।

'চতুর্দশপদী'-র ৩টি নিখুঁত দৃষ্টান্ত পরপর দেখলেন। এবার দেখুন শর্ত-না-মানা এমন ৩টি দৃষ্টান্ত, যার কবি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। মিশ্রবৃত্ত পয়ারে বাঁধা ১৪টি চরণের কাঠামো ছাড়া 'চতুর্দশপদী' হবার মতো আর কোনো গুণ কবিতা তিনটির নেই।

দৃষ্টান্ত-১.

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয় — ক
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময় — ক
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার — খ
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার — খ
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত — গ
নানাবর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মতো — গ
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায় — ঘ
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায় — ঘ
তোমার মন্দির-মাঝে
ইন্দ্রিয়ের দ্বার — চ
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার। — চ
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে — ছ
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে — ছ

মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া, — জ
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া। — জ

[মুক্তি ঃ নৈবেদ্য]

দৃষ্টান্ত-২.

কী লাগিয়া বসে আছ, চাহিয়া রয়েছে কার লাগি, — ক
প্রলয়ের পরপারে নেহারিছ কার আগমন, — খ
কার দূর পদধ্বনি চিরদিন করিছ শ্রবণ, — খ
চিরবিরহীর মতো চিররাত্রি রহিয়াছ জাগি। — ক
অসীম অতৃপ্তি লয়ে মাঝে মাঝে ফেলিছ নিশ্বাস, — গ
আকাশপ্রান্তরে তাই কেঁদে উঠে প্রলয়বাতাস, — গ
জগতের ঊর্নাজাল ছিঁড়ে টুটে কোথা যায় ভাগি। — ক
অনন্ত আঁধার মাঝে কেহ তব নাহিস দোসর, — ঘ

পশে না তোমার প্রাণে আমাদের হৃদয়ের আশ, গ
পশে না তোমার কানে আমাদের পাখিদের স্বর। ঘ
সহস্র জগতে মিলি রচে তব বিজন প্রবাস, গ
সহস্র শরদে মিলি বাঁধে তব নিঃশব্দের ঘর— ঘ
হাসি, কাঁদি, ভালোবাসি, নাই তব হাসি কান্না মায়া— চ
আসি, থাকি, চলে যাই কত ছায়া কত উপছায়া॥ চ

দৃষ্টান্ত-৩. এ জন্মের সাথে লগ্ন স্বপ্নের সূত্র যবে
ছিঁড়িল অদৃশ্য ঘাতে, সে মুহূর্তে দেখিনু সম্মুখে
অজ্ঞাত সুদীর্ঘ পথ অতিদূর নিঃসঙ্গের দেশে
নিরাসক্ত নির্মমের পানে। অকস্মাৎ মহা-একা
ডাক দিল একাকীরে প্রলয়তোরণচূড়া হতে।
অসংখ্য অপরিচিত জ্যোতিষ্কের নিঃশব্দতামাঝে
মেলিনু নয়ন ; জানিলাম একাকীর নাই ভয়,
ভয় জনতার মাঝে ; একাকীর কোনো লজ্জা নাই,
লজ্জা শুধু যেথা-সেথা যার-তার চক্ষুর ইঙ্গিতে।
বিশ্বসৃষ্টিকর্তা একা, সৃষ্টিকাজে আমার আহ্বান
বিরাট নেপথ্যলোকে তাঁর আসনের ছায়াতলে।
পুরাতন আপনার ধ্বংসোন্মুখ মিলন জীর্ণতা
ফেলিয়া পশ্চাতে, রিক্তহস্তে মোরে বিরচিতে হবে
নূতন জীবনচ্ছবি শূন্য দিগন্তের ভূমিকায়।

[প্রান্তিক-৩]

দৃষ্টান্ত-১-এর কবিতাটিতে ১৪টি চরণ আছে, প্রতিটি চরণে ৮+৬ মাত্রা আছে, ছন্দরীতিও মিশ্রবৃত্ত। কিন্তু, মিলের ছক **কক খখ গগ ঘঘ চচ ছছ জজ**। অর্থাৎ, ৭-রকমের অন্ত্যমিলে তৈরি ৭-জোড়া চরণ বা ৭টি যুগ্মকে কবিতাটি ভাগ হয়ে আছে। অথচ, ভাবের দিক থেকে কবি নিজেই কবিতাটিকে ভাগ করেছেন ৩টি স্তবকে—প্রথম স্তবকে ৮.৫টি, দ্বিতীয় স্তবকে ৩.৫ টি আর শেষ স্তবকে ২টি চরণ। এ-রকম অদ্ভুত স্তবক-বিভাগ 'চতুর্দশপদী'র ইতিহাসে কেবল রবীন্দ্রনাথই করেছিলেন। অন্যমিল আর স্তবক-বিভাগে কোনো আদর্শ বা প্রথাকে এ কবিতায় গ্রাহ্যই করা হয়নি।

দৃষ্টান্ত-২-এ ১৪ চরণের এমন একটি কবিতা এই প্রথম পেলেন, যার প্রতিটি চরণ ৮+১০ মাত্রার বড়ো পয়ারে বাঁধা। ছন্দরীতি অবশ্য আগের মতোই মিশ্রবৃত্ত। কিন্তু, মিলের ছক **কখখক গগকঘ গঘগঘ চচ** যা এতকাল ধরে চালু ৩টি আদর্শের ১টিকেও মানছে না। ছকটি দেখে মনে হবে, পরপর ৩টি চতুষ্ক আর ১টি যুগ্মক নিয়ে সেক্স্‌পিরীয় আদর্শের স্তবক-বিভাগ। অথচ, ভাবের দিক থেকে স্তবক-চারটি এইরকম—প্রথমে ১টি চতুষ্ক, মাঝখানে পরপর ২টি ত্রিতক (৩-চরণ), শেষে ১টি চতুষ্ক। এর অর্থ, স্তবক-বিভাগও কোনো আদর্শের তোয়াক্কা করে না।

দৃষ্টান্ত-৩-এর কবিতাটি ৮+১০ মাত্রার বড়ো পয়ারের আর-একটি নমুনা। ১৪-চরণের আয়তনে মিশ্রবৃত্ত রীতির পয়ারের বাঁধন ছাড়া আর কোনো গুণ এর নেই, যার ওপর ভর করে কবিতাটি চতুর্দশপদী' হবার দাবি তুলতে পারে। প্রথমে ২টি দৃষ্টান্তে মিল আর স্তবক-বিভাগে কোনো-না-কোনো ছক ছিল-ই। আলোচ্য দৃষ্টান্তে লক্ষ করুন—চরণশেষে মিল নেই, স্তবক-সাজানোর দায় নেই।

৩৬.১০ সারাংশ-৩

ইতালি-ইংরেজ-ফরাসি সনেটের আদলে তৈরি বাংলা কবিতার ছন্দোবন্ধের নাম **চতুর্দশপদী**।

চোদ্দ শতকের ইতালীয় কবি ফ্রান্সিস্কো পেত্রার্কা, ষোলো শতকের ফরাসি কবি ক্লেঁসে মারো, আর সতেরো ইংরেজ কবি সেক্স্পিয়ার—এঁদের হাতে তৈরি হল সনেটের ৩টি আদর্শ। এই ৩টি আদর্শেই লেখা হতে লাগল বাংলা সনেট বা 'চতুর্দশপদী', প্রথম কবি মধুসূদন দত্ত।

'চতুর্দশপদী' কবিতাকে ১৪-চরণের কাঠামো নিয়ে আরো ৪টি শর্ত মেনে চলতে হয়—প্রতিটি চরণ পয়ারের, ছন্দরীতি মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান, পেত্রার্কীয় ফরাসি বা সেক্স্পিরীয় ছকে স্তবক-বিভাগ, একই ছকে চরণ-শেষের মিল। ছক-তিনটি এইরকম—

ছক	স্তবক-বিভাগ	চরণশেষের মিল
পেত্রার্কীয়	৮-চরণ (অষ্টক) + ৬-চরণ (ষট্ক)	কখখক-কখখক চছজ-চছজ
ফরাসি	৮-চরণ (অষ্টক) + ২-চরণ (যুগ্মক) + ৪-চরণ (চতুষ্ক)	কখখক-কখখক গগ চছচছ
সেক্স্পিরীয়	৪-চরণ (চতুষ্ক) + ৪-চরণ + ৪-চরণ + ২-চরণ (যুগ্মক)	কখখক-গঘগঘ পফপফ চচ

ক খ গ ঘ প ফ চ ছ জ — এগুলি চরণশেষের মিলের চিহ্ন।

তবে য়ুরোপীয় আদর্শের ছক বাঙালি সনেট-কারেরা সবসময় মেনে চলেন নি। এমনকী, রবীন্দ্রনাথের বেশকিছু কবিতা কেবল ১৪-চরণের মিশ্রবৃত্ত পয়ার, অথচ 'চতুর্দশপদী' নামেই চালু।

৩৬.১১ অনুশীলনী—৩

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখার পর ২১৯ পৃষ্ঠার উত্তর-সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১. চতুর্দশপদী-ছন্দোবন্ধের 'চতুর্দশপদী' নাম সংগত কিনা, কথাটির অর্থ এবং এ ছন্দোবন্ধের পক্ষে আবশ্যক শর্তগুলি উল্লেখ করে আলোচনা করুন।

২. (ক) চতুর্দশপদীর আশ্রয় কী কী আদর্শ, লিখুন।
   (খ) চতুর্দশপদীর স্তবক-গঠনের ছক কী কী রকমের, লিখুন।
   (গ) চতুর্দশপদীর মিলের ছক কী কী রকমের, লিখুন।

৩. (ক) নীচের স্তবকগুলির প্রতিটি ছত্রের শেষে মিল-চিহ্ন (ক খ গ ঘ ইত্যাদি) বসান, তারপর দৃষ্টান্তটি চতুর্দশপদীর কী ধরনের স্তবক আর মিলের ছক হতে পারে, লিখুন ঃ

(i) স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,
'ওরে বাছা মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি ?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যারে ফিরি ঘরে।'

(ii) হে রবীন্দ্র, তোমার ও সুন্দর-সনেট
কি সরল ! নারিঙ্গির সুরভি সমীরে,
মুক্ত বাতায়নে বসি ক্ষুদ্র জুলিয়েট,
ফেলিছে বিরহশ্বাস যেন গো সুধীরে।

(iii) মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
হে কাশি, কবীশদলে তুমি পুণ্যবান্।

(খ) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(i) য়ুরোপীয় সাহিত্যে যে ছন্দোবন্ধের নাম _____, বাংলায় তারই নাম চতুর্দশপদী।

(ii) _____ শতকের ইতালীয় কবি _____, _____ শতকের ফরাসি কবি _____ আর _____ শতকের ইংরেজ কবি _____ এর হাতেই গড়ে উঠল চতুর্দশপদীর মূল য়ুরোপীয় আদর্শ।

৩৬.১২ সামগ্রিক অনুশীলনী

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখার পর ২২০ পৃষ্ঠার উত্তর-সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১. (ক) কাকে বলে, লিখুন ঃ পয়ার, অমিত্রাক্ষর, চতুর্দশপদী।

(খ) পার্থক্য কী, বুঝিয়ে দিন ঃ

ছন্দরীতি আর ছন্দোবন্ধ, সাধারণ (অপ্রবহমান) পয়ার আর অমিত্রাক্ষর।

(গ) নীচের ছন্দোবন্ধে কী কী গুণ থাকা জরুরি, লিখুন ঃ পয়ার, অমিত্রাক্ষর, চতুর্দশপদী।

২. নীচের দৃষ্টান্ত কোন শ্রেণির ছন্দোবন্ধের, কারণ জানিয়ে লিখুন ঃ

(ক) তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার
বারম্বার।

(খ) জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে !
বহুদেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে ?
দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্ম-ভূমি-স্তনে !

(গ) প্রিয়তমা সখী মম ? সদা আমি ভাবি
তাঁর কথা। ছিনু যবে তাঁহার আলয়ে,
কত যে করিলা কৃপা মোর প্রতি সতী
বারুণী, কভু কি আমি পারি তা ভুলিতে ?

(ঘ) যারা আমার সাঁঝ-সকালের গানের দ্বীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো
আপন হিয়ার পরশ দিয়ে ; এই জীবনের সকল সাদা-কালো
যাদের আলোক-ছায়ার লীলা ; মনের মানুষ বাইরে বেড়ায় যারা
তাদের প্রাণের ঝরণা—স্রোতে আমার পরাণ হয়ে হাজার ধারা

৩৬.১৩ গ্রন্থপঞ্জি

ছন্দরীতি বিষয়ে ব্যাবহারিক পরিভাষা	প্রবোধচন্দ্র সেন ঃ নূতন ছন্দ-পরিক্রমা	অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ঃ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র	পবিত্র সরকার ঃ ছন্দতত্ত্ব ছন্দরূপ
ছন্দোবন্ধ	পৃ-২৪১	পৃ-১৮	পৃ-৫৪
পয়ার	পৃ-২৪৯, ৫০,১৭০-৮৯	পৃ-১৮, ৭৬	×
প্রবহমানতা	পৃ-২৫৭	×	পৃ-১০৭, ১১২
মুক্তক	পৃ-১৮০-৮৯, ২৬৮	×	পৃ-১২, ১৩, ১০৭, ১১৭-২০, ১৪৭
অমিত্রাক্ষর	পৃ-২৩২, ২৩৩, ১৭৬-৮০	পৃ-১৯, ৭০-৭২	পৃ-১১১-১৫
চতুর্দশপদী	×	পৃ-৮৫, ৮৬	পৃ-১৪৫, ১৪৬